ছোটোদের বার্ষিকী

খালাপালা

১৪২৭

সম্পাদক

অশোককুমার মিত্র

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

শংকর বসাক

পুনশ্চ

ঝালা পালা

'ঝালাপালা'র জন্মলগ্ন থেকে গত চল্লিশ বছরে এমনটি কখনও ঘটেনি। শুধু পূজা নয়—পূজার মাসও পেরিয়ে গেল, তবু 'ঝালাপালা বার্ষিকী' তার পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারিনি। ছাপা হরফে মহালয়া প্রকাশ-সময় লেখা হলেও তার অনেক আগেই 'ঝালাপালা' প্রকাশিত হয়ে থাকে। এবারে অবশ্য পঞ্জিকার হিসাব মতো মহালয়ার এক সপ্তাহ পরে নয়, পাঁচ সপ্তাহ পরে পুজোর ঢাক বাজল, তবু 'ঝালাপালা' তার ভালবাসার পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া গেল না, এমনকী দীপাবলী-জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের পরও নয়। অথচ এবারে আমাদের পরিকল্পনা ছিল পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে স্বাধীনতা লাভের দিনে ১৫ আগস্ট এবারের 'ঝালাপালা গল্প বার্ষিকী' প্রকাশ করব। সে কারণে এবারে গল্পের নতুন বিষয়ও স্থির করা হয়েছিল একটু পৃথক—সামাজিক গল্প মানবিক মুখ। বাংলা ছোটোদের গল্পে সামাজিক গল্পের প্রিয়ধারাটি যেন ক্রমবিলুপ্তির পথে। ভয় ছিল, এ ধরনের লেখায় অনভ্যস্ত লেখক-বন্ধুরা কি এমন লেখায় আগ্রহ বোধ করবেন? আমাদের আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করে লেখক বন্ধুরা সামাজিক গল্প লিখেছেন নানান ছাঁদের, নানান স্বাদের। এসব তাঁরা পাঠিয়েছেন আমাদের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে—অর্থাৎ এপ্রিল মাসের ভিতর। এমনকী আমাদের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি পূর্ণমাপের উপন্যাসও পাঠালেন এক বন্ধু। প্রায় পঞ্চাশটি ছোটো-বড়ো নানা স্বাদের গল্প-উপন্যাসে আমাদের ডালি উপচে পড়েছে। 'হারানো দিন চিরনবীন' পর্যায়ে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (এবারে তাঁর জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী) কথামালার একটি গল্পে চরিত্রগুলি মনুষ্যতের পশু হলেও তাদের আচরণে লক্ষ্যণীয় মানবিক গুণ।

এবার বলি, রচনা সংগ্রহের পাশাপাশি যখন প্রকাশনা সংক্রান্ত অন্যান্য কাজও চলছে এমন সময়ে পৃথিবী জোড়া বিপর্যয় নেমে এল করোনা ভাইরাস নামক অদৃশ্য শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে। বিপর্যস্ত, বলা যায়, বিধ্বস্ত হল জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। একে সামাল দিতে নানান দেশে নানা প্রতিরোধ পন্থার প্রয়োগ চলল। প্রথমে লক ডাউন করে, বলা যায় জীবনের স্পন্দন বন্ধ করার প্রয়াসে সব রাষ্ট্র চালকেরা মেতে উঠলেন। ধীরে ধীরে লক ডাউন শিথিল করা হলেও স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ কবে আমরা ফিরে পাব? অন্য ক্ষেত্রের মতো বইপাড়ার ক্ষতিও অবর্ণনীয়।

তবু অন্য দুর্যোগের ঝাপটা সামাল দিয়ে যখন আমরা 'ঝালাপালা' প্রকাশে উদ্‌যোগী হয়েছি তখনই 'ঝালাপালা' মুদ্রণের জন্য যাঁদের ওপর সবচেয়ে নির্ভর করে থাকি তাঁরা একে একে করোনায় আক্রান্ত হলেন। ফলে আমাদের প্রয়াসে কিছু শৈথিল্য এল বটে, পরে সে প্রয়াসে জল ঢালা হয়ে গেল যখন সম্পাদক মশাই নিজেই সি.ও.পি.ডি রোগের শিকার হয়ে হাসপাতাল যাত্রী হলেন।

তখনি সিদ্ধান্ত হল, পুজোয় নয় শীতের বড়ো উৎসব বড়োদিনে এবারের ঝালাপালা প্রকাশিত হবে। বড়োদিনের সঙ্গে বাংলা ছোটোদের হলেও বার্ষিকী প্রকাশের একটি সূক্ষ্ম সংযোগ রয়েছে। বাংলা প্রথম বার্ষিকীর পরিকল্পক ও সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গিয়েছিলেন। বিলেতে দেখেছিলেন বড়োদিনের আনন্দ সম্পূর্ণ করতে সে দেশে ছোটোদের জন্য অনেক আকর্ষণীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দেশে ফিরে তিনি অবশ্য বড়োদিনে নয় এ দেশের সবচেয়ে বড়ো উৎসব কালে অবকাশে শারদ পার্ব্বণী নামে প্রথম বার্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। এবারে বড়োদিনের উৎসবে 'ঝালাপালা' প্রকাশ মুহূর্তে আমরা বাংলা বার্ষিকীর জন্ম ইতিহাস স্মরণ করলাম।

তোমাদের জন্য রইল বুকভরা ভালোবাসা।

২৫ ডিসেম্বর, ২০২০
কলকাতা ৭০০১০৬

ঝালা পালা

সূচিপত্র

হারানো দিন চিরনবীন

সিংহ ও ইঁদুর	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৫
বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৬
অসহযোগী	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৭
সব চেয়ে যা বড়ো	প্রতিভা বসু	১০
আপদ	শিশিরকুমার মজুমদার	১৫

বড়ো গল্প

'টিজিটি' ও 'থ্রিএনটু'	সলিল চট্টোপাধ্যায়	২৩
পলাশডাঙা নিস্তারিণী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	অশোককুমার মিত্র	৩০
রহস্যের অন্তরালে	দীপ মুখোপাধ্যায়	৪০
ভয়	দীপান্বিতা রায়	৫০
খালপাড় বিদ্যালয়	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য	৫৮

উপন্যাস

বাঘমুড়ির পাহাড়ে	প্রবাস দত্ত	৬৫

অনুগল্প

সীতা এবং এক পাহাড়ি নদী	জ্যোতির্ময় দাশ	১২০

গল্প

খ্যাপাস্যার	অভিজিৎ সেনগুপ্ত	১২৭
লালু-কালু-ভুলু	সুনীল জানা	১৩২
তখন অচেনা	শেখর বসু	১৩৪
অথ বার্তাকু-অলাবু কথা	বলরাম বসাক	১৩৭
এক যে ছিল লোক	অমর মিত্র	১৪১
একটি ঠোঙার গল্প	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৩
ডাবের জল	অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	১৪৭
রাজ্যের নাম বিক্রমগড়	কুমার মিত্র	১৫০
করোনা মহামারির ঝড়ে	সনৎকুমার মিত্র	১৫৪
কেয়া ও বাঘমামা	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৬
গৃহত্যাগ	অরুণ আইন	১৬০
স্বজন	তৃষিত বর্মণ	১৬৩
বন্ধুবাবুর মিষ্টি কাহিনি	তপনকুমার দাস	১৬৭
খালিপুর ভ্রমণ	গৌর বৈরাগী	১৭২
বন্ধু আমার	শুভমানস ঘোষ	১৭৭
কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং	সুধীন্দ্র সরকার	১৮০
পুজোর আনন্দ	পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮২
জিৎ	সৈকত মুখোপাধ্যায়	১৮৬
মিঠির ডায়েরি	ছন্দা চট্টোপাধ্যায়	১৯১
মঠবাড়ির মাণিকজোড়	শিশির বিশ্বাস	১৯৩
তোকে ছাড়ব না	জয়দীপ চক্রবর্তী	১৯৭
নবজীবন	অনন্যা দাশ	২০১
তিনখানা চাঁদ	রতনতনু ঘাটী	২০৪
সোনার ছোঁয়ায়	শোভন শেঠ	২০৮
এগরোল	কাবেরী চক্রবর্তী	২১২
মোতি	চন্দন চক্রবর্তী	২১৪
ভুল অঙ্ক	মেধস ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৭
রহমৎ	গৌতম হাজরা	২২০
পাপাইয়ের বন্ধু	তনুজা চক্রবর্তী	২২২
চেনা	শুভায়ন বসু	২২৫
ক্যাডবেরি	মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ	২২৮
পার্ক স্ট্রিটের বাড়ি	কৌশিক ঘোষ	২৩১
প্রতিশোধ	দেবাশিস সেন	২৩৪
মালিক	সঞ্জয় কর্মকার	২৩৮

সিংহ ও ইঁদুর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক সিংহ, পর্বতের গুহায়, নিদ্রা যাইতেছিল। দৈবাৎ, একটা ইঁদুর, সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে, সিংহের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে, ইঁদুর নির্গত হইলে, সিংহ, ঈষৎ, কুপিত হইয়া, নখরের প্রহার দ্বারা, তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইল। ইঁদুর, প্রাণভয়ে কাতর হইয়া, বিনয় করিয়া, কহিল, মহারাজ! আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া, আমায় প্রাণদান করুন। আপনি সমস্ত পশুর রাজা: আমার মত ক্ষুদ্র পশুর প্রাণবধ করিলে, আপনকার কলঙ্ক আছে। সিংহ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, এবং, দয়া করিয়া, ইঁদুরকে ছাড়িয়া দিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, সিংহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক শিকারির জালে পড়িল; বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই জাল ছাড়াইতে পারিল না। পরিশেষে, প্রাণরক্ষা বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া সে, এমন ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল যে, সমস্ত অরণ্য কম্পিত হইয়া উঠিল।

সিংহ, ইতঃপূর্বে, যে ইঁদুরের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, সে ঐ স্থানের অনতিদূরে বাস করিত। এক্ষণে সে, প্রাণদাতার স্বর চিনিতে পারিয়া, সত্বর সেইস্থানে উপস্থিত হইল, তাহার এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, জাল কাটিতে আরম্ভ করিল, এবং, অল্প ক্ষণের মধ্যেই, সিংহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

নীতিকথা : কাহারও উপর দয়া প্রকাশ করিলে, তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না। যে যতক্ষুদ্র প্রাণী হউক না কেন, উপকৃত হইলে, কখনও না কখনও প্রত্যুপকার করিতে পারে।

বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক বৃদ্ধা নারীর চক্ষু নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল; এজন্য, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। নিকটে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আমার চক্ষুর দোষ জন্মিয়াছে, আমি কিছু দেখিতে পাই না; আপনি আমার চক্ষু ভাল করিয়া দেন; আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব; কিন্তু, ভাল করিতে না পারিলে, আপনি কিছুই পাইবেন না।

চিকিৎসক, বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পর দিন, প্রাতঃকালে, তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া, চিকিৎসকের অতিশয় লোভ জন্মিল। তিনি স্থির করিলেন, প্রতিদিন, ইহাকে দেখিতে আসিব, এবং এক একটি দ্রব্য লইয়া যাইব। এজন্য, যাহাতে শীঘ্র তাহার পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন। পরে, একে একে সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়া, তিনি রীতিমত ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার চক্ষু, অল্প দিনেই, পূর্ববৎ, নির্দোষ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, তাহার একটিও নাই; অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, চিকিৎসক একে একে, সমুদয় লইয়া গিয়াছেন।

একদিন চিকিৎসক বৃদ্ধাকে কহিলেন, আমার চিকিৎসায় তোমার পীড়ার শান্তি হইয়াছে। পীড়ার শান্তি হইলে, আমায় বিদায় কর। বৃদ্ধা, চিকিৎসকের আচরণে, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এজন্য, কোনও উত্তর দিলেন না। চিকিৎসক, বারংবার চাহিয়াও, পুরস্কার না পাইয়া, বৃদ্ধার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। বৃদ্ধা বিচারকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং, চিকিৎসককে স্পষ্ট বাক্যে চোর না বলিয়া, কৌশল করিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যদি আমার চক্ষু পূর্ববৎ হয়, কোনও দোষ না থাকে, তবে উঁহাকে পুরস্কার দিব। উনি কহিতেছেন, আমার চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে; কিন্তু, আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার চক্ষু এখনও নির্দোষ হয় নাই। কারণ, আমার চক্ষুর দোষ জন্মে নাই, আমার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, সে সমস্ত দেখিতে পাইতাম। পরে, চক্ষুর দোষ জন্মিলে, সে সকল দেখিতে পাই নাই; এখনও, সে সব দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে, উঁহার চিকিৎসায়, আমার চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে, আমার সেরূপ বোধ হইতেছে না। এক্ষণে, আপনাদের বিচারে, যাহা কর্তব্য হয়, করুন।

বিচারকেরা, বৃদ্ধার উত্তরবাক্যের মর্ম বুঝিতে পারিয়া, হাস্যমুখে, তাঁহাকে বিদায় দিলেন, এবং, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, চিকিৎসককে, বিচারালয় হইতে, চলিয়া যাইতে বলিলেন।

অসহযোগী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেনের বাবা হর্ষনাথ ধনেশগঞ্জের মস্ত আড়তদার। বছরখানেক আগে রমেনকে তিনি তার পিসতুতো ভগ্নীপতি সূর্যপদর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—ছেলেটাকে একটু শান্তশিষ্ট-ভদ্র বানাবার আশায়। রমেন একেবারে মারাত্মক রকম দুরন্ত হয়ে উঠেছিল, কিছুতেই তিনি তার সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। দু-তিনবার কোর্টে পর্যন্ত তাঁকে দৌড়োতে হয়েছিল ছেলের জন্য। শেষে রমেন যখন একদিন ম্যাজিস্ট্রেট মি. বসুর ছেলেকে মেরে রক্তারক্তি করে দিল, তখন তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন এ ছেলেকে সামলে চলা তাঁর সামর্থ্য নয়। এ ছেলে তার সর্বনাশ করবে। যুদ্ধের বাজারে কত কামাচ্ছেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চটালে রক্ষা আছে? দামি দামি ভেট নিয়ে তিনি সটান গিয়ে হাজির হলেন একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে, মার-খাওয়া ছেলেটির জন্যই উপহার রইল দু'শো টাকার। লুটিয়ে পড়লেন মিসেস বসুর পায়ের তলে, প্রার্থনা করলেন রমেনের নিস্তার। ছেলের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করবেন আগেই ভেবে ঠিক করে ফেলেছিলেন, তাই বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন যে, ভয় পেয়ে রমেন কোথায় পালিয়ে গেছে, ফিরে এলে খুঁটিতে বেঁধে তাকে তিনি চাবকে লাল করে দেবেন।

সেইদিন রমেনকে নিয়ে তিনি কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন, —ছেলেকে সূর্যপদর জিম্মা করে দেবার জন্য।

রমেনের মা একটা আপত্তি করেছিলেন!

'উনি স্বদেশি-টদেশি করেন শুনেছি, খোকাকে আবার না বিগড়ে দেন।'

হর্ষনাথ বলেছিলেন, 'স্বদেশি না ছাই! জেলে যেত না স্বদেশি করলে? ওসব টাকা উপায়ের ফিকির। ছেলেদের নিয়ে দলটল সমিতি-টমিতি করে চাঁদা তুলবার জন্যে। মাস্টারিতে কী চলে?'

শহরতলিতে সূর্যপদর বাড়ি। এক রাত্রির বেশি ইন্দুনাথ থাকতে পারেননি। তাঁর কত কাজ ধনেশগঞ্জে। সূর্যপদকে সব জানিয়ে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, 'ছেলেটাকে তোমার মানুষ করে দিতে হবে ভাই।'

সূর্যপদ হেসে বলেছিলেন, 'দেব। ছেলেকে তোমার মানুষ করে দেব।'

একটা শর্ত করেছিলেন সূর্যপদ যে, এক বছরের মধ্যে রমেনক ধনেশগঞ্জে নেওয়া চলবে না আর রমেনকে টাকা পাঠানো চলবে না। হর্ষনাথ রাজি হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

রমেনের খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলে সূর্যপদ মোটে পঁচিশ টাকা নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি গরিব মাস্টার, তোমার ছেলের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু পঁচিশ টাকার বেশি খরচ ওর লাগবে না।'

পরের মাসে হর্ষনাথ পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে পঁচিশ টাকা ফেরত আসায় খুশি হয়ে রমেনের মাকে বলেছিলেন, 'না লোকটা সত্যি ভালো। ছেলেটাকে শুধরে দিতে পারবে বলে মনে হয়।'

একবছর পরে পুজোর ছুটিতে রমেন বাড়ি এল। তার পরিবর্তন দেখে প্রথম ক'দিন হর্ষনাথ পরম খুশি। যেমন চেহারায় কথায়, ব্যবহারেও তেমনি সে শান্তশিষ্ট-ভদ্র হয়ে এসেছে। উশকোখুশকো ঝাঁকড়া চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা কিন্তু তাও আঁচড়ানো, জামা-কাপড় সস্তাদামের কিন্তু দিব্যি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মুখখানা হাসিখুশি, কথা মিষ্টি, চালচলন নম্র। সারাক্ষণই প্রায় তিড়িং-বিড়িং করে লাফাত এমনি সে চঞ্চল ছিল এক বছর আগে, অকাজের পর অকাজ না করলে তার স্বস্তি ছিল না। একটা কথা কোনোদিন সে কারো শুনত না। সে চাপল্য, শয়তানি বুদ্ধি আর অবাধ্যতা কোথায় উড়ে গেছে!

সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়ায়, এই যা একটু দোষ। কিন্তু কোনো

অপকর্মের খবর না পেয়ে এবং বাড়ি ফিরলে ছেলের দেহে বা কাপড়-জামায় দুরন্তপনার চিহ্ন না দেখে হর্ষনাথ নিশ্চিন্ত হন। ভাবেন এতদিন পরে দেশে এসেছে, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো আড্ডা দিচ্ছে সাধ মিটিয়ে। ওতে আর কী আসে যায়?

দিন সাতেক পরে মনে তাঁর খটকা লাগে। আড়ত থেকে ভাত খেতে বাড়ি ফিরে দ্যাখেন কী, শ'তিনেক দুর্ভিক্ষের কাঙালি মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো বাড়ির পাশে ফাঁকা বটগাছ তলায় পাত পেতে ভাত খাচ্ছে, পরিবেশন করছে রমেন আর তারই বয়সি পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলে। দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল হর্ষনাথের।

বাড়ির মধ্যে গিয়ে ধপাস করে বসে ছেলেকে তিনি ডেকে পাঠালেন।

'এসব কী হচ্ছে?'

রমেন তখন উৎসাহে ফুটছে।—'ওদের খাওয়াচ্ছি বাবা। কত হিসেব করে খাওয়াতে হচ্ছে জানো? কদ্দিন ধরে খায় না, বেশি খেলে মরবে। তা কী বোঝে ব্যাটারা? সবাই চেঁচাচ্ছে—আরও দাও, আরও দাও! সামলানো দায়।'

'চাল-ডাল সব পেলি কোথা?'

'মা দিয়েছে।'

রমেনের মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আহা আবদার ধরেছে, খাওয়াক না। সবাই আশীর্বাদ করছে। ভালো হবে।'

'ভালো হওয়াচ্ছি।'

বাড়ির ভাঁড়ার প্রায় ছোটোখাটো একটি গুদাম ঘর। আগে হর্ষনাথ রমেনের মার কাছ থেকে ভাঁড়ারের চাবি সংগ্রহ করলেন। তারপর বটতলার খাওয়া শেষ হলে সকলকে হাঁকিয়ে দিলেন।

রমেন বলল, 'আমি ওদের সাতদিন রোজ খাওয়ার কথা বলেছি বাবা। তারপর ওরা গাঁয়ে ফিরে যাবে।'

'চুপ কর। বেয়াদব কোথাকার!'

দিন যায়। প্রতিদিন চারিদিকে অসহায় ক্ষুধিতের কান্না হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে। রমেন আর হাসে না। খেতে বসে ভাত ছড়িয়ে উঠে যায়। দুধ পড়ে থাকে দুধের বাটিতে, সন্দেশ পিঁপড়েয় খায়। হর্ষনাথ রাগ করে বলেন, 'কী জ্বালা বাপু! কেন হয়েছে কী?'

'সবাই না খেয়ে মরে যাবে, তুমি কিছু করবে না বাবা?'

'দিলাম যে কুড়িমণ চাল বিলিফে?'

'কুড়ি মণ। তোমার আড়তে হাজার হাজার মণ চাল রয়েছে। সবাই ছি ছি করছে বাবা। আমায় ঘেন্না করছে তোমার ছেলে বলে।'

'চুপ কর! বেয়াদব কোথাকার!'

দুদিন রমেনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রমেনের মা কেঁদে-কেটে অস্থির হন। মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হলেও হর্ষনাথ বাইরে মুখ গম্ভীর করে থাকেন। রাগে ভয়ে দুশ্চিন্তায় তার মেজাজটা যায় বিগড়ে। ভাবেন, রমেন ফিরলে মেরে তাকে আস্ত রাখবেন না। দুদিন পরে রমেন ফিরলে তার চোখের চাউনি দেখে দুটো ধমক

দিতেও কিন্তু তাঁর সাহস হয় না। কেমন এক খাপছাড়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে রমেন আজকাল তাঁর দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছিল, দেখে তাঁর কেমন ভয় ভয় করে।

'কোথা গিয়েছিলি না বলে?'

'অনাথবাবুর সঙ্গে সাতগাঁয়ে।'

অনাথবাবুর সঙ্গে! তাঁর পরম শত্রু অনাথবাবু, এই সেদিন যার জন্য প্রায় হাজার মণ চাল গুদামে তোলার বদলে বাঁধা দামে বিক্রি করে দিতে হয়েছে তাঁকে।

'বাবা, কী অবস্থা হয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না। তুমি এক কাজ করো বাবা। যে দামে কিনেছিলে, এক টাকা লাভ রেখে চাল বেচে দাও। তোমার তো লোকসান হবে না, কত লোক বাঁচবে ভাবো দিকি!'

'লোকসান হবে না, না? চল্লিশ টাকার জায়গায় চোদ্দো টাকায় বেচলে লোকসান হবে না, কী হিসেব তুই শিখেছিস?' কথাটা হর্যনাথ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

তখন রমেন বলে, 'তা হলে তোমার সব চাল আমি বিলিয়ে দেব বাবা। আগে থেকে বলে রাখলাম। তোমায় আমি মানুষ খুন করতে দেব না।'

'ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিসনি, থাবড়া খাবি।'

'বলে রাখলাম। দেখো।'

ছেলেমানুষের হালকা কথা, কে তা মনে রাখে? আড়তে তার কত লোকজন, গুদোম তালাবন্ধ, চাইলেই কী আর চাল বিলিয়ে দিতে পারবে রমেন—পঞ্চাশজন বন্ধু আর অনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এলেও নয়। সেজন্য হর্যনাথের ভাবনা হল না। ছেলের পাগলামি দেখে মনটা শুধু খারাপ হয়ে গেল। কী কুক্ষণেই ছেলেকে মানুষ হতে পাঠিয়েছিলেন সূর্যপদর কাছে! এর চেয়ে ছেলেটা শয়তান-গুন্ডা থাকাও ভালো ছিল—বয়স বাড়লে আপনি শুধরে যেত।

দিন কতক পরে হর্যনাথ ব্যবসার কাজে তিন দিনের জন্য বাইরে গেলেন। আড়তে বলে গেলেন, রমেন এসে গোলমাল করলে যেন ভালোভাবে শাসন করে দেওয়া হয় আর অনাথবাবু এসে হাঙ্গামা করলে যেন সোজা পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। একবার থানাটাও ঘুরে গেলেন, অনাথবাবু কীভাবে তার ছেলের মাথা বিগড়ে দেবার চেষ্টা করছেন জানিয়ে দেবার জন্য।

পরদিন সকালে আড়তে ও আড়তের সামনে হইহই কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। নিতাইচরণ আড়তের প্রধান কর্মচারী, বাবু নেই বলে আড়ত খুলতে লোক পাঠিয়ে নিজে একটু বেলা করে হেলতে দুলতে এসে দ্যাখে কী, প্রায় শ'পাঁচেক লোক জমা হয়েছে আড়তের সামনে। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে নিতাইচরণের চক্ষুস্থির! আড়তের যে কোণে হাজার টিন তেল ছিল পরশু পর্যন্ত, সেখানে মেঝেতে তেল আর ময়লার পুরু পাঁকের ওপরেই আড়তের সবাই বসে আছে, তফাতে হর্যনাথের দু'নলা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রমেন। রমেনের সমবয়সি ছেলেতে আড়ত বোঝাই।

'আসুন নিতাইকাকা। গুদোমের চাবিটা দিন তো।'

'চাবি? চাবি কোথা পাব? চাবি তোমার বাবার কাছে।'

'তা হলে ওখানে গিয়ে বসুন। দরজা ভাঙতে হবে।'

রমেনের এক বন্ধু তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তেল গাদায় ধপ করে বসিয়ে দেয়।

রমেন বলে, 'এই বন্দুক দিয়ে একজনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিলুম মনে আছে তো? কেউ কোনো ফন্দি-ফিকির-চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। সত্যি সত্যি গুলি করব কিন্তু।'

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে রমেন ওদের পাহারা দেয়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দেড়শো ছেলে গুদাম থেকে চাল বার করে বিতরণ করে। কাছে ও দূরের অনেকগুলি গাঁ থেকে হাজার হাজার লোক আসে চালের জন্য। রমেন গাঁয়ে গাঁয়ে ট্যারা পিটিয়ে দিয়েছিল।

পুলিশ দু'চারজন আসে কিন্তু ঢুকবার চেষ্টা করে না বরং ভিড় আর হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে কিছু কিছু সাহায্যই করে। ভোরে রমেন নিজে গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছিল, তার বাবা আজ চাল বিতরণ করবেন। এই মর্মে বড়ো বড়ো কয়েকটা ইস্তাহারও আড়তের বাইরে টাঙিয়ে রেখেছিল।

সন্ধ্যার সময় চাল শেষ হল।

খবর পেয়ে পরদিনই হর্যনাথ ফিরে এলেন। ছেলেকে সামনে রেখে গুম খেয়ে রইলেন। তাঁর কান্না পাচ্ছিল!